রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণ শান্তিনিকেতনের জীবন্ত ঐতিহ্য

সিতাংশু রায়

রবীন্দ্রসংগীতের সুর 'জীবন্ত অমর ভাবে উপর' স্থাপিত। সে সুরের সংরক্ষণ ও প্রসার একান্তই প্রয়োজন। শূন্যে তা যেন মিলিয়ে না যায়। কণ্ঠে কণ্ঠে প্রবাহিত হতে গিয়ে তা যেন রচয়িতার বিশেষত্বকে বিসর্জন দিয়ে না ফেলে। হার্মোনিয়াম ও স্বরবিতান- নির্ভর শিক্ষক ও শিক্ষর্থীর গায়নক্রিয়ার মধ্যে তা যেন কৃত্রিমতায় পর্যবসিত না হয়। তা-ই তো হচ্ছে আজকাল।

স্বরলিপির উপযোগিতা আছে। সুর সংরক্ষণের জন্যে রেকর্ডের পরই স্বরলিপির স্থান। পাশ্চাত্য সংগীতে প্রতিটি স্বর ঋজু ও বিচ্ছিন্ন, তাই সেখানে স্বরলিপির স্কে ার ও সংগীতের রূপায়ণের মধ্যে পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে, আমাদের সংগীতে ত্রিসপ্তকের স্বরগুলির মধ্যে যে বহু বিচিত্র মীড় আশ গমক শ্রুতি ভূষিকা স্পর্শস্বরের গলাগলি সম্বন্ধ বন্ধ নতা নির্ভর করে গায়ক-গায়িকার প্রতিভা শিক্ষা সাধনা দক্ষতা ও ব্যক্তিগত সাংগীতিক মেজাজের ওপর। পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের তুলনাত্রমে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে আমাদের সংগীতে স্বরের সঙ্গে স্বরের 'নাড়ির সম্পর্ক', আমাদের শ্রুতি যেন সংগীত-দেহের 'সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র'। এখন, শুধু আকার মাত্রিক কেন, কোনো স্বরলিপি পদ্ধতিই আমাদের সংগীতের সূক্ষ্মতা অর্জন করেনি। তাই স্বরলিপির কাঠামো বা 'ধরাকাঠ' থেকেই রচয়িতার বিশেষত্ব কিছুটা ধরে নিতে হয়, কিছুটা গড়ে নিতে হয়। মূল সুরকে বজায় রেখেও 'এক্সপ্রেশনের ভেদ' ও 'ইন্টারপ্রিটেশনের স্বাধীনতা' বা 'freedom within a small range' গায়ক-গায়িকাভেদে কিছু পরিমাণে তো স্বীকৃতি। সেই ভেদটা কে নির্ধারণ করবেন? কে গড়পড়তার দলে, আর কে প্রতিভাবান, তা কে ঠিক করবেন? যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসংগীত সাধনায় রস পেয়ে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ভাবেন 'আমিই ঠিক'। তাই, গানের সুর একই রূপে অনড় থাকে না। মূল কাঠামোটি একরকম থাকলেও এক্সপ্রেশনে ইন্টারপ্রিটেশনে গায়ক-গায়িকার স্বকীয়তা এসে যায়ই যায়।

এখন, গান গাইবার সময় গায়ক-গায়িকার স্বকীয়তা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই স্বরলিপি রচনার সময় স্বরলিপিকারের নিজস্ব শিক্ষা, প্রতিভা, চি, সৌন্দর্যবোধ, উৎকর্ষ সাধন, বিস্মৃতি ও পুনগঠন, অলঙ্করণের খুঁটিনাটিকে রাখা অথবা সরলীকরণ, এই সবই স্বরলিপির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। অনবধানতাজনিত সাংগীতিক ত্রুটিও প্রচুর অনুপ্রবেশ করেছে স্বরবিতানের খণ্ডে খণ্ডে। রাগনামের ত্রুটি, সুরের ত্রমান্বয়ের ত্রুটি, তালখালির ত্রুটি ইত্যাদি। ঠিক গুনে দেখার আগেও আনুমা নিকভাবে বলতে পারি শতকরা দশটি গানে এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। তালবাদ্য বাদ দিয়ে গাইলে 'সমমাত্রা' থাকলেই যথেষ্ট, তালবাদ্য থাকলে তালখালিকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। দাদরা কাহারবার কথাই ধরা যাক। গান গাইলেই সকলের কানে ধরা পড়ে তাল বিভাগের কোনটি গু, কোনটি লঘু। বলাই বাহুল্য, গুটি তাল, লঘুটি ফাঁক বা খালি। স্বরলিপিতে এটি উল্টে গেলে কি ক'রে চলবে? বহু স্বরলিপিতে সেই কাণ্ডটিই ঘটেছে।স্বরবিতানে স্বরলিপি একবার মুদ্রিত হ'য়ে গেলেই তা নির্ভুল ও সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য, তা কখনোই নয়। তা সত্ত্বেও প্রতিটি স্বরলিপির উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য সুরের আদলটি, মুল রূপটি জেনে নেবার জন্যে। 'Variation' বা 'improvisation' না ক'রেও তাকে সংগীত সম্মত করার দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষিকার, গায়ক-গায়িকার ও সেই সঙ্গে বাদক-বা দিকার। রবীন্দ্রসংগীত প্রথমত সংগীত, স্বরলিপির অনুবর্তন নয়। স্বরলিপির ঈষৎ ঈষৎ সুরবিকল্পের একটা বিকল্প মাত্র; অনড় ও অদ্বৈত সুরসংরক্ষণ নয়। রবীন্দ্রন াথের জীবৎকালে প্রকাশিত স্বরলিপি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের, দীনেন্দ্রনাথের, সাহানাদেবীর, রবীন্দ্রনাথ-ও-রমা করের গাওয়া গানের সুর ও সেই সব গানের প্রকাশিত স্বরলিপির সুর বেশ বেশ পৃথক।

সুরশিল্পের নিজেরই প্রাণশক্তি আছে। তাকে 'সর্বাঙ্গসুন্দরতার পার্‌ফেক্‌শনের ফর্মে' অচলভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। রাবীন্দ্রিক বিশেষত্ব বজায় রেখেও কম বেশী সুরভেদ বরাবরই ঘটে এসেছে, এখনও ঘটে থাকে গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে কণ্ঠে রেকর্ডে রেকর্ডে ও স্বরবিতানের বিভিন্ন সংস্করণের স্বরলিপিতে। সমগ্রভাবে এটি রবীন্দ্রসংগীত সংস্কৃতির তথা সংগীতসংস্কৃতির প্রাণেরই লক্ষণ। কিছু অনাচার অরাজকতা রসহীনতাকে আগেও রোধ করা যায়নি, এখনও তো রোধ করা যাচ্ছে না। সেটি বড়ো কথা নয়। এখন সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রসংগীতের রস ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন।

সেই বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বের মাপকাঠিও একটি নয়। অন্তত তিন চার রকমের গায়নশৈলী রাবীন্দ্রিক বিশেষত্বের দাবী রাখে। সেগুলির মধ্যে নিশ্চয় কিছু সাধারণ ধর্ম লক্ষণীয়। ভিন্ন ভিন্ন চির মধ্য থেকে রসের এক সূক্ষ্ম ঐক্যকে নিশ্চয়ই লক্ষ করা যায়। গায়ন শৈলীর কোন কোন দিক বিশেষত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে? কণ্ঠের ওজন বা amplitude, মন্দ্র ও তারসপ্তকে কণ্ঠের সীমা, রাগ সংগীতের শিক্ষার ভিত্তি, স্বর স্থানের সঠিক প্রয়োগ, মীড়ের ধরন, অলঙ্করণের সুস্পষ্টতা ও পারিপ াট্য, উচ্চারণের আভিজাত্য,শ্বাসনিয়ন্ত্রণ, আনুষঙ্গিক যন্ত্র নির্বাচন ও সেগুলির বাদনক্রিয়া সবের ওপর সামগ্রিক অভিব্যক্তি— এগুলি যার যেমন তার গায়নশৈলীর বিশেষত্ব সেইভাবে গড়ে উঠবে। স্বরলিপির মাধ্যমে সুর সংরক্ষণের বেলায় এই প্রসঙ্গ জড়িত। কারণ, সুর শুধু সংগ্রহশালার ব্যাপার নয়, তাকে ধবনিত হয়ে উঠতে হবে।

তা ছাড়া, বিশেষত্ব কি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থির বস্তু? রূপকের ভাষায় বলা হয় বটে ' Music is architecture of sound', কিন্তু কলা জগতে স্থাপত্য নির্মাণের পর স্থির ও অচঞ্চল, পক্ষান্তরে, সংগীত গতিময় ললিতকলা, সময় ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যা চলে, গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে কণ্ঠে যা বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। তাই, স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করা গেলেও সংগীতের বিশেষত্বকে সেভাবে নির্ধারণ করে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়া যায় না, স্বরলিপির ম াধ্যমেও নয়, রেকর্ডের মাধ্যমেও নয়। সংগীতসাধনকে, বিশেষভাবে রবীন্দ্রসংগীতসাধনাকে দৈনন্দিন জীবনে জীবন সাধনার অঙ্গ করে নিলে তবেই সুরের ধারা প্রবহমানা থাকবে, বেগবতী থাকবে।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার আরো চলতেই থাকবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে, পেশাদার ও শৌখীন গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে কণ্ঠে। সাধারণ শিক্ষা ও সংগীত সংস্কৃতির অগ্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণের বিশেষত্বের উৎকর্ষই ঘটবে, এই রকমই আশা করা যায়। তা সত্ত্বেও বেশ দেখতে পাচ্ছি Institutionalism, individualism, আর commercialism এগুলির প্রভাব সংগীতসংস্কৃতিকে একটি মাত্র আদর্শের দিকে নিয়ে চলছে না, গড়ে তুলছে চির পার্থক্য, চাহিদার বিভিন্নতা, তুলনা ও যাচাই করার প্রবণতা। তাই তো একজনের স্বরলিপি আর এক জনের সম্পাদনায় কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক গুর স্বরলিপি আর এক গু মানেন না, ভিন্নতর সুরে গান শেখান। আবার কেউ কেউ স্বরলিপি দেখে বলেন-এই সুরে তো আমরা এই গান গাই না। তাঁদের নিজেদের জানা সুরে গান শেখান।

এইসব সুরভেদকে অনেকে সমস্যা বলে ভাবেন। বস্তুত, এগুলি সমস্যাই নয়, বরং সম্ভার। অল্পবিস্তর সুরভেদ থাকলে তো ভালোই। আমরা আমাদের আপন আপন সাংগীতিক রসবোধ অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রটি একটু বড়ো করে পাই। সুরের মূল আদল থেকে সরে না গেলেই হ'ল, কানে বিসদৃশ না ঠেকলেই হ'ল, সুরকে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যসম্মত মনে হ'লেই হ'ল। সুর শিল্প জিনিসটিই তো নমনীয়, 'duo-decimal ladder' মাত্র নয়, বারোটি স্বরের key-board-এর ব্যাপারমাত্র নয়, স্বরলিপির 'blue print' -এর ওপর দাগা বোলানোর অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে বলে 'স্বরলিপি follow করা, তার ব্যাপার নয়। স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে, 'শাসনের তর্জনী-উত্থানের জন্যে নয়।

সুরের দিক থেকে ও তালের দিক থেকে কবির টপ্পাগানের বা টপ্পাঙ্গের গানের স্বরলিপি কতখানি নিখুঁত করা সম্ভব? এই ধরনের গান তো চলে অনেকটা মুক্ত ছন্দের চালে। ভাবপ্রকাশের খাতিরে তালছাড়া গাইলে ঠিক আছে। কিন্তু তবলার সঙ্গে গাইতে ব'সলে 'সমের মাশুল'-কে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। তালের আবর্তে আবর্তে গানের সুরকে 'টেনে বাড়ানো' ও 'ছেঁটে কমানো'-র প্রয়োজন ঘটতেই পারে, অবশ্যই সাবলীল ও সুচাভাবে, গান কিন্তু সম্-ছুট হ'লে চলবে না। এই সব গানের স্বরলিপিকার স্বরলিপির একটি কাঠামো নিশ্চয় দেবেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই, অর্থাৎ তা সুর সংরক্ষণের কাঠামো মাত্র। 'Variation' এবং 'improvisation' -এর কিছু স্বাধীনতা গায়ক-গায়িকার থাকবে আপন আপন রসবোধ ও যোগ্যতা অনুসারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'এ পরবাসে রবে কে' গানটির স্বরলিপির উল্লেখ করা যেতে পারে। আইনস্টাইনের কাছে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে তুলনাত্রমে ভারতীয় সংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে কবিই বলেছেন-

'... in India we have freedom of melody with no freedom of time.' একথা হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য, রাগাশ্রিত গান সম্বন্ধেও অনেকখানি প্রযোজ্য, কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গ গান, পল্লী সংগীত ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, এমনকি, যে কথা বলতে চাইছি ..... যে কোনো রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধেও কম বেশি প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া 'আমারে কে নিবি ভাই', 'আমার শেষ পারানির কড়ি', 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু' আমরা যেমনটি শুনতে পাই, স্বরলিপিতে তেমনটি সংরক্ষিত হয়নি। 'এসো এসো ফিরে এসো' গানটি কবি তালমুক্তভাবে গেয়েছেন। স্বরলিপিতে দাদরায় বাঁধা সুর কবির গাওয়া সুরের থেকে অনেক অনেকখানি পৃথক। এই গান গাইতে গেলে গায়ক-গায়িকার সামনে তিনটি বিকল্প। এক, স্বরলিপি অনুসারে গাওয়া, দুই, কবির রেকর্ড শুনে ওই সুর শিখে গাওয়া, তিন, কবির সুর ও গায়নভঙ্গিকে সাধ্যমতো গ্রহণ করে দাদরা (লোফা) বা একতালে গাওয়া। তৃতীয় বিকল্পটির কথা কেন ব'লছি বলি।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল করতাল যোগে গানটি গাইছে এমন বর্ণনা পাচ্ছি। সুতরাং গানটি নিশ্চয় তালে গাইবার যোগ্য। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে তাল বর্জন ক'রতে হবে তার কোনো মানে নেই। বরং গল্পের পটভূমিতে তাল একান্তই প্রয়োজন, নায়কের চিত্তে যা ছন্দোময় অনুরণন তুলেছে। সেই ছন্দ ও সুরের নায়ক শশিভূষণ পদের পর পদ সংযোজন ক'রে ক'রে গানকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে। আমরা পদ সংযোজন করব না। কিন্তু এই গানের ভৈরবী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন জনের কণ্ঠে কণ্ঠে কিছুটা বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্নতা এসে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্বরলিপিটির উপর একান্ত নির্ভরতা মোটেই কাম্য নয়। তাতে সংগীতের বন্ধনই ঘটবে, মুক্তি নয়।

'কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছলভরে' গানটির স্বরলিপি কবির ঈপ্সিত সুরের পরিবেশ থেকে আমাদের সরিয়ে এনেছে অন্য পরিবেশে, পূর্বাহ্নের সিন্ধু ভৈরবী থেকে একেবারে রাত্রিকালের কাফিতে। কল্পনা কাব্যে লীলাশীর্ষক এই কবিতায় বা গানে কবি সুরের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সিন্ধু ভৈরবী। প্রকাশিত স্বরলিপির খরজ পরিবর্তন ক'রে শুদ্ধ রে-কে (ঋষভকে) সা ধ'রলে, অর্থাৎ রা ণা ধা পা যদি সা পা মা গাওয়া হয় তা'হলে সিন্ধু ভৈরবীর আদলটি পাওয়া যাবে। গানের সুরের কোনো পরিবর্তন হবে না। শুধু প্রতিটি স্বর এক পর্দা ক'রে নেমে আসবে তাই-ই হবে এটির সঠিক সুর।

রবীন্দ্রসংগীতের জগতে শান্তিনিকেতনের গায়কির oral tradition -এ আমি এতকাল বিশ্বাস ক'রে এসেছি। পদে পদে এখানে স্বরলিপি দেখার প্রচলন ছিল না ক্লাসে ও মহড়ায়। প্রাত্যহিক বৈতালিকের গান, বিশেষ বিশেষ বৈতালিকের গান, পূর্ণিমা রাত্রের বৈতালিকের গান, বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের গান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের গান, শারদোৎসব ও বহুল মঞ্চস্থ নাটকের গান ইত্যাদি সকলের স্মৃতিতে collective memory -র মতো ও সকলের কানে ও গলায় collective property -র মতো এখানে সংরক্ষিত ছিল। আশ্রম জীবনের সাংগীতিক পরিবেশকে সেই আদর্শেই সঞ্জীবিত রাখা আমাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বরলিপি বাইরের লোকেদের আদর্শ। তা ছাড়া তাদের উপায়ও নেই। আমাদের সারাদিনের ও সারাবছরের সাংগীতিক পরিবেশ বাইরের শিক্ষার্থী-শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানের পথপ্রদর্শক ও আদর্শ হয়ে উঠুক। এইখানেই আমাদের সতর্কতা। কেননা, শান্তিনিকেতনই রবীন্দ্রসংগীতের তীর্থস্থান। একথা আমরা যেন না ভুলি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com